অতিরিক্ত খরচের চাপে অভিভাবকরা

কোচিং নিষিদ্ধ হলেও ঢাকায় চলছে শিক্ষকদের সহস্রাধিক সেন্টার

মেহেদী হাসান

প্রকাশ : ০৬ জানুয়ারি ২০২৫, ০৬:০০

ছবি: সংগৃহীত

আইনে নিষিদ্ধ থাকলেও রাজধানীতে চলছে শিক্ষকদের সহস্রাধিক কোচিং সেন্টার। অনেকটা বাধ্য হয়েই সেই সব কোচিং সেন্টারে ভর্তি করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। কোচিং না করলে নম্বর কম দেওয়া ও ফেল করিয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এমনকি কোনো কোনো স্কুলে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করার ঘটনাও ঘটছে।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

এছাড়া শ্রেণিকক্ষে পরিপূর্ণ শিক্ষা পাঠদানে নিশ্চিত হতে পারছেন না অভিভাবকরা। যে কারণে বাধ্য হয়েই তারা সন্তানদের নিয়ে আসছেন একই শিক্ষকের কোচিং সেন্টারে। মাসের ব্যয়ের হিসাবে যা তৈরি করছে বাড়তি চাপ। অধিকাংশ কোচিং সেন্টারে ব্যাচে শিক্ষার্থীদের পড়ানো হচ্ছে। ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী পড়তে আসছে বেশি। বরাবরের মতো এবারও বছরের প্রথম মাস থেকেই শুরু হয়েছে এসব কোচিং। অনেক অতি উৎসাহী অভিভাবক তাদের সন্তানকে সকালে এক কোচিং এবং বিকালে আরেক কোচিংয়ে পাঠাচ্ছেন। অনেক অভিভাবক কোচিং ও বাসায় প্রাইভেট দুটিই চালিয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা ২০১২ সালে প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। হাইকোর্টের আদেশে ২০১৯ সালে তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। ঐ নীতিমালা অনুযায়ী, কোনো শিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে কোচিং করাতে পারবেন না। তবে প্রতিষ্ঠানপ্রধানের অনুমতি নিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক ১০ শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে পারেন। ঐ শিক্ষার্থীদের নাম, রোল ও শ্রেণি সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে জানাতে হবে। এ নীতিমালা ঢাকাসহ দেশের কোথাও মানা হচ্ছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ১৫ বছর ধরে এই ব্যাপারে চুপচাপ ছিল। নীতিমালা বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা 'মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর' (মাউশি) দীর্ঘদিন ধরে বসে আছে 'হাত গুটিয়ে'। ব্যবস্থা নিতে জনবলসংকটের কথা বলে দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন কর্মকর্তারা। ফলে এটি এখন 'কাগুজে নীতিমালা'য় পরিণত হয়েছে। সরকারি নির্দেশনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে রাজধানীতে এক শ্রেণির স্কুলশিক্ষক রমরমা কোচিং বাণিজ্যে মেতে উঠেছেন।

কোচিং না করায় মাস ছয়েক আগে মোহাম্মদপুরে একটি বেসরকারি স্কুলের ইংরেজি ভার্শনের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী এমএ রায়হানকে ব্যাপক মারধর করেন স্কুলশিক্ষক। রায়হানকে গত বছরের প্রথম মাস থেকে শিক্ষক তার কাছে প্রাইভেট পড়তে বলেন। কিন্তু রায়হানের বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় ছেলেকে ঐ শিক্ষকের কোচিং সেন্টারে দিতে পারেননি তিনি। পরে গত জুন মাসে অকারণে রায়হানের পিঠে ব্যাপক কিল-ঘুষি মারেন ঐ শিক্ষক। এতে তার পিঠের হাড় ভেঙে যায়। এক মাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল রায়হান। এখনো তাকে কুঁজো হয়ে হাঁটতে হয়। এই ঘটনায় রায়হানের বাবা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ ও থানায় মামলা দায়ের করেন। পরে ঐ শিক্ষক তৎকালীন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে নিয়ে রায়হানের বাসায় যান এবং থানার মামলা প্রত্যাহার করার হুমকি দেন। পরে জীবন বাঁচাতে বাধ্য হয়ে রায়হানের বাবা মামলা প্রত্যাহার করে নেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে। দোষী প্রমাণিত হওয়ার পরও 'শাস্তি' হিসেবে ঐ শিক্ষককে কেবল স্কুলের ছেলে শাখা থেকে মেয়ে শাখায় বদলি করা হয়। ঐ স্কুলের আরও দুই জন শিক্ষক অন্তত ৩০ জন শিক্ষার্থীর পেটে আঘাত করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের মূল ক্যাম্পাস, শাখা ক্যাম্পাসগুলোর আশপাশে হাঁটলে কোচিং সেন্টারের অসংখ্য সাইনবোর্ড চোখে পড়ে, যেগুলো ঐসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা চালান। রাজধানীর শাহজাহানপুরে রয়েছে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের শিক্ষকদের অনেক কোচিং সেন্টার। উত্তরা ব্যাংকের গলিসংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন বাসাবাড়ি হাজারো শিক্ষার্থীর কাছে হয়ে উঠেছে স্কুলের বিকল্প; অনেকের কাছে শ্রেণিকক্ষের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে নামে-বেনামে গড়ে উঠেছে কয়েক শতাধিক কোচিং সেন্টার। এমনকি ফার্মেসির সাইনবোর্ড টানিয়ে ভেতরে শিক্ষার্থী পড়াতেও দেখা গেছে। আইডিয়াল স্কুলের মতিঝিল ও মুগদা শাখা, মতিঝিল সরকারি বালক ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মতো নামি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরই এসব কোচিং সেন্টারে বেশি আসতে দেখা যায়। পড়াচ্ছেনও এসব শিক্ষালয়ের শিক্ষকরা। তারা এককভাবে অথবা কয়েক জন মিলে গড়ে তুলেছেন কোচিং সেন্টার। মিরপুরের মনিপুর স্কুলের শেওড়াপাড়া, ইব্রাহীমপুর ও রূপনগর শাখার চারপাশে কোচিং সেন্টারের ছড়াছড়ি। রূপনগরে 'চারুপাঠ' নামের একটি কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে মনিপুর স্কুলের ব্রাঞ্চ-১ থেকে, যা কয়েক শ গজের মধ্যে। এই স্কুলেরই কয়েক শিক্ষক কোচিং সেন্টারটি চালান বলে জানা যায়।

সারা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পৌনে দুই লাখ কোচিং সেন্টারের লাগামও টেনে ধরা যাচ্ছে না। এমনকি কোচিং সেন্টারগুলোকে 'ছায়াশিক্ষা' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে সোচ্চার এক শ্রেণির শিক্ষক। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুসারে, কোনো শিক্ষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোচিং সেন্টারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হতে পারেন না। নিজে কোচিং সেন্টারের মালিক হতে পারেন না। শিক্ষার্থীদের কোচিংয়ে পড়তে উৎসাহিত, উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করতেও পারেন না। নীতিমালায় বলা হয়েছে, অভিভাবকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানপ্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারেন।

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে তদারকি করতে মেট্রোপলিটন ও বিভাগীয় এলাকার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারকে সভাপতি করে ৯ সদস্যের কমিটি থাকার কথা। জেলার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে আট সদস্যের কমিটি গঠনের কথা নীতিমালায় বলা হয়েছে। বাস্তবে এসব কমিটির কার্যকারিতা দেখা যায় না। নীতিমালা অনুসারে এমপিওভুক্ত বা এমপিওবিহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত বা এমপিওবিহীন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তার এমপিও স্থগিত, বাতিল, বেতনভাতা স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন একধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তি হতে পারে। তবে বিগত এক যুগে একজন শিক্ষককেও কোচিং সেন্টার পরিচালনার দায়ে শাস্তির মুখে পড়তে দেখা যায়নি।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী গতকাল ইত্তেফাককে বলেন, ‘শিক্ষায় বড় সংস্কার দরকার। শিক্ষাকে ক্লাশমুখী করতে হবে। এক্ষেত্রে বড় ফ্যাক্ট হলো শিক্ষকরা। তারা যাতে ক্লাশ রুমে ভালোভাবে পড়ান সেই ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও সামাজিক সম্মান বাড়াতে হবে। যাতে মেধাবী তরুণরা শিক্ষকতা পেশায় উৎসাহিত হন।’

স্কুলে ভালো না পড়িয়ে কোচিং করানোর মানসিকতার জন্য শিক্ষকদের বেতন-ভাতা কম থাকাকেই দায়ী করেছেন অনেক শিক্ষাবিদ। সম্প্রতি একাধিক জরিপ থেকে জানা যায়, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি শিক্ষার্থী প্রাইভেট পড়ে। বিশেষ করে মেট্রোপলিটন, বিভাগীয় ও জেলা শহরে কোনো শিক্ষার্থী প্রাইভেট পড়ে না, তা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ার হার বাড়ছে। একটি গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য থেকে জানা যায়, কোচিংয়ের কারণে বর্তমানে শিক্ষা ব্যয়ের সিংহভাগই রাষ্ট্রের পরিবর্তে পরিবারের ওপর বর্তাচ্ছে। দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৯ ভাগ ও সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত (এমপিওভুক্ত) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যয়ের ৭১ ভাগই পরিবার নির্বাহ করে। এ ব্যয়ের সিংহভাগই যায় কোচিং-প্রাইভেটের পেছনে।